KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন 202 রাসবিহারী এভিনিউ, কল-২৯
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5.5"x8.5"
Vol. & Number : 18/4 20/1 20/2 20/4 21/1	Year of Publication : Aug 1954 Sep 1955 Dec 1955 June 1956 Sep 1956
	Condition : Brittle ✓ / Good ✓
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে

অষ্টম খণ্ড

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

সপ্তদশ খণ্ড

রবীন্দ্র রচনাবলী

মোট এই খণ্ডগুলি বর্তমানে পাওয়া যায়—ক. কাগজের মলাট সংস্করণ। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট টাকা—১ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬॥ খ. সাধারণ কাগজে ছাপা, রেক্সিনে বাঁধাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য এগারো টাকা—১ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ২৪ ২৫ ২৬॥ গ. মোটা কাগজে ছাপা, রেক্সিনে বাঁধাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য বারো টাকা—৭ ৮ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ২১ ২২

রবীন্দ্র-রচনাবলী পাবার সহজ উপায়॥ আপনি কোন্ কোন্ খণ্ড সংগ্রহ করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে (৬৷৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা ৭) চিঠি লিখে তা জানিয়ে, স্থায়ী গ্রাহক হয়ে থাকা। ক খ গ কোন্ রকমের বই আগে কিনেছেন তা জানালে সেই রকম বই দেবার চেষ্টা করা হবে। কোনো খণ্ড প্রকাশিত বা পুনর্মুদ্রিত হলেই গ্রাহকদের চিঠি লিখে জানানো হয়। গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধপত্রই যথেষ্ট, কোনো দক্ষিণা বা অগ্রিম মূল্য জমা দিতে হয় না।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা

কবিতা

আষাঢ় ১৩৬১

অষ্টাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা ৭৮

অপঘাত

অমিয় চক্রবর্তী

নতুন পার্কার পেনে মসৃণ কাগজে পদ্য লেখা,
মার্কিনের আয়োজন : জানলার বাহিরে রোদ্দুর,
একটু নীল পর্দা ছায়া, পাশে শেল্‌ফে দু'চারটে বই
(হাক্‌স্‌লির নতুন গন্থ, সমুদ্রের গল্প হেমিংওয়ের,
ইচ্ছেমতো পড়বার), চেলোর রেকর্ড রেখে ফের
বন্ধু চলে গেছে ; মনে কম্পিত শান্তির লাগে সুর,
ঘরে আসতে ঝিল-পথে দূর ভাবনা ডুবেছে অথই,
কোরিয়ায় যুদ্ধ থামবে ক্ষীণ বুঝি জাগে আশা-রেখা।

সারি সারি কথা শুধু মসৃণ কলমে মিথ্যে লেখা,—
খাতা বন্ধ ক'রে বসি। দেখি সামনে অলগ্ন রোদ্দুর,
নীল পর্দার শূন্য, পাশে স্তব্ধ সদ্য ছাপা বই
(ধার্মিক শঠ্যের ভাষ্য, উজ্জ্বল প্রবন্ধ ; হাঙরের
সঙ্গে যোঝে বুড়ো মাঝি : ঝোড়ো গল্প) কানে ক্ষীণ জের
ইস্পানী অদৃশ্য তন্ত্রী, মনের বাঙ্ময় কোথা সুর
কবিতায় ঝামরে আসা, ঝিলের ঝলক গেল কই,
কোরিয়া আগুনে পোড়ে, রেডিয়ো ছড়ায় দগ্ধ রেখা॥

হোমরের ষট্‌মাত্রা

বিষ্ণু দে

ছিল একদিন কস্তুরীমৃগ কৈশোরকের চিত্তে
ঝর্ণার বেগ, দ্রুতমুহূর্ত্ত পাহাড়ে মাত্রাবৃত্তে
তীব্র তড়িতে মেলাতে চেয়েছি ক্ষণিকাকে চুম্বনে
সম্বৃত একা ত্রিকালখোদাই পরম চিরন্তনে।
গ্রীষ্মে ঝর্ণা হারায় পাথরে বালিতে,
বর্ষায় ছোটে ঢল ভেঙে জল ঢালুতে।
আজকে দুপাশে সমুদ্র দূর দিকে দিকে দেয় পাড়ি,
অনেক নৌকা বিদেশী জাহাজ গাংচিল ঝাঁকে ঝাঁকে,
হৃদয়ে মিশেছে আরেক কালের অনেক দেশের খাড়ি,
পাহাড়ের বেগ স্মৃতিমন্থিত আরেক বেগের বাঁকে।

সেদিন আমার বাসা ছিল মাঘফাগুনে,
বিভোল সে গানে কালের ত্রিতাল কে শোনে!
অনেক জনের অনেক দিনের বহু বছরের স্রোতে
কতো না রৌদ্রে সুরবেসুরের উর্মিল সঙ্গীতে
তোমার আপন আবেগে মেলাই আমার সাগরযাত্রা,
সাফোর ঝর্ণা কলকল্লোলে হোমরের ষট্‌মাত্রা॥

আদিনাগ

(ভালেরি-র "এবোশ্‌ দ্যাঁ সের্প" অবলম্বনে)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মহীরুহ দোদুল মারুতে,
সর্পবেশী আমি শাখাচর ;
দন্তরুচি ক্ষুধার বিদ্যুতে
প্রভাস্বর আমার অন্তর।
সঞ্চারী সে-মরীয়া ক্ষুধায়
বীতস্বত্ব নন্দন সুধায়,
লেলিহান দ্বিরুক্ত রসনা।
জন্তু আমি, তীক্ষ্ণধীও বটে ;
কিন্তু নেই হেন বিষ ঘটে
যাতে ডোবে ঋষির চেতনা॥

রম্য এই প্রমোদের কাল!
মর্ত্যবাসী, সাবধান : আমি
জৃম্ভণেও প্রবল, ভয়াল ;
আশুতোষ নই, অন্তর্যামী।
নীলিমার ক্ষুরধার স্নেহে
অসংবৃত, ছদ্ম নাগদেহে,
জীবনের পাশব প্রসাদ।
আয়, জড়ভরতের জাতি,
আয়, হেথা আমি ওত পাতি,
নিয়তির মতো অপ্রমাদ॥

সূর্য, সূর্য, হিরণ্ময় হানি,

মৃত্যু ঢাকা যার চন্দ্রাতপে,
যার মন্ত্রে স্ফূর্ত কানাকানি
ফুলে ফুলে, পাদপে পাদপে,
দৃপ্ত তুমি, হে সূর্য, আমার
সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক, আর
চক্রান্তের আলম্ব ; কারণ
জগৎ যে বিশুদ্ধ অভাবে
কলঙ্ক, তা তোমারই প্রভাবে
অস্বীকার করে মুগ্ধ মন ॥

মহাদ্যুতি, তুমিই জাগাও
প্রাণবহ্নি সত্তার বিগ্রহে,
তথা তার ক্ষেত্র মেপে দাও
প্রত্যক্ষের স্বপ্নান্ত আবহে।
হৃষ্ট মরীচিকার প্রণেতা,
কী সংকল্পে নিমগ্ন প্রচেতা,
চাক্ষুষ তা তোমার রূপকে।
হে স্বরাট্ ছায়ার সম্রাট,
ভালোবাসি ভরো যে-বিরাট্
মিথ্যা তুমি শূন্যের কূপকে ॥

যথাজাত তোমার উত্তাপে
আলস্যের তুষার শিথিল,
স্মৃতি প্রতিধ্বনিত বিলাপে,
আমি প্রত্ন বিপাকে জটিল।
একাকার কায়ার পতন

দেখেছিল এ-দিব্য কানন ;
এ-আরাম সে-জন্যেই প্রিয় :
ক্রোধ পায় ইন্ধন এখানে,
কুণ্ডলিনী উদ্বুদ্ধ পুরাণে,
উন্মুখর অনির্বচনীয় ॥

অহংকার, তুমি মূলাধার,
চক্রবর্তী আকাশে আকাশে,
দেশগত জগৎ-সংসার
খুলেছিলে বাণীর বিভাসে।
নিত্য আত্মদর্শনে বুঝি বা
অপ্রচার্য স্রষ্টার প্রতিভা ;
মুক্ত তাই পূর্ণের অর্গল,
উপজাত বিধির ব্যত্যয়,
ছত্রভঙ্গ সিদ্ধান্তে নিশ্চয়,
তারাপুঞ্জে কৈবল্য বিকল ॥

ব্যোম তার ভ্রান্তির প্রমাণ,
সর্বনাশ স্বাক্ষরিত কালে,
আরম্ভেই উল্কাপাত—প্রাণ।
ধাবমান ব্যাদত্ত পাতালে।
কিন্তু আমি প্রথম প্রণবে,
অদ্বিতীয় স্ফূর্তবাক নভে,
উপস্থিত, অতীত, আগামী ;
আত্মহারা ঐশ্বর্যের হ্রাস
করি লুব্ধ আলোকে প্রকাশ ;
নিরাকার মোহিনীর স্বামী ॥

আষাঢ় ১৩৬১

বর্তমান ঘৃণার আধার,
ভূতপূর্ব নয়নের মণি,
প্রেমিকের যোগ্য পুরস্কার
নরকের অক্ষয় পত্তনি ?
দেখো মুখ আমার তিমিরে !
যে-ছবি সে-গরীষ্ঠ গভীরে
মুকুরিত, একদা তা দেখে,
নৈরাশ্যে ও ধিক্কারে ব্যাকুল,
অনুরূপ মাটির পুতুল
গড়েছিলেশ্রদ্ধাব্যতিরেকে ॥

পশুশ্রম : মৃত্তিকাসঞ্জাত,
সাবলীল তোমার সন্তান
করেছিল স্তবে প্রতিভাত
তুমি বটে সর্বশক্তিমান ;
কিন্তু সুষ্ঠু ভাস্কর্যের সেরা,
প্রত্যাদিষ্ট নবজাতকেরা
শুনেছিল বিরামে বিরামে
আমি বলি, "ওরে আগন্তুক,
শ্বেতকায়, উলঙ্গ, উন্মুখ,
পশু তোরা, নর শুধু নামে" ॥

"তোরা যার সৌসাদৃশ্যদোষে
আশপ্ত ও আমার স্খলিত,
অপূর্বের স্রষ্টা যদিও সে,
তবু তার রচনা গর্হিত।
সিদ্ধহস্ত আমি সংশোধনে ;

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৪

প্রস্তুত যে আত্মসমর্পণে,
আমি তার মরমী সহায়।
শ্লথ যত উরঙ্গশাবক
হয়ে ওঠে উদ্যত তক্ষক
আমাদের যৌথ প্রচেষ্টায়" ॥

অপ্রমেয় আমার মনীষা
খুঁজে পায় মানুষের মনে
প্রতিহিংসাপূরণের দিশা
যা সম্ভব তোমারই সৃজনে।
রহস্যের দুস্থ অবরোধে,
নাক্ষত্রিক ধূপের আমোদে,
বিশ্বাপিতা যেথা ইচ্ছাময়,
সেখানেও করে অধিরোহ
আত্যন্তিক আমার সন্দেহ,
স্পর্শক্রামী বিদ্রোহের ভয় ॥

আসি, যাই সত্বর, মসৃণ,
শুচি চিত্তে হই নিরুদ্দেশ।
কার বক্ষ এমন কঠিন
রুদ্ধ যাতে চিন্তার প্রবেশ ?
যেই কেন হোক না সে, তার
মর্মে আত্মরতির সঞ্চার
সংঘটিত আমারই প্রভাবে।
স্বার্থে আমি প্রতিষ্ঠিত ব'লে,
স্বরূপের আবরণ খোলে,
অনুপের বিকাশ স্বভাবে ॥

ঈভ্-ও, দেখেছিলুম একদা,
ভাবনার প্রারম্ভে চকিত,
ওষ্ঠাধরে অবাক্ ব্যবধা,
গোলাপের লাস্যে উচ্ছ্বসিত।
সুপ্রশস্ত হৈম কটিতট ;
অনবদ্য গৌরবে প্রকট ;
নিঃশঙ্ক সে রৌদ্রে ও মানুষে ;
অঙ্গীকৃত বায়ুর আশ্লেষ ;
দেহদ্বারে আত্মার প্রবেশ
প্রত্যাহত বুদ্ধির প্রত্যুষে॥

আহা, ভূমানন্দের সংহতি,
মরি, মরি, তুই কী সুন্দর !
সুমতির মতো, মহামতি
তাই তোর সেবায় তৎপর।
তারা তোর দীর্ঘশ্বাস শুনে,
ঝাঁপ দেয় প্রেমের আগুনে।
যে নিষ্পাপ, সে আরও তন্ময় ;
যে কঠোর, সেই অত্যাহত।…
আমি পালি পিশাচ, প্রমথ,
তবু তুই গলালি হৃদয়॥

সরীসৃপে পক্ষীর উল্লাস :
উহ্য আমি পাতার আড়ালে ;
ছলনার সূক্ষ্ম নাগপাশ
বিরচিত হয় বাক্যজালে।
ইতিমধ্যে রূপমুগ্ধ চোখে

পান করি, রে বধিরা, তোকে ;
আমি তোর প্রচ্ছন্ন কাণ্ডারী।
ব্যক্ত গতি গ্রীবার বিভ্রমে,
দীপ্র তুই হিরণ্ময় রোমে,
শান্ত, স্বচ্ছ মাধুর্যের ভারী॥

আপাতত অনতিগভীর,
অতীন্দ্রিয় প্রকৃতপ্রস্তাবে,
ভাব আমি, সৌগন্ধমদির
তোর মর্ম যার আবির্ভাবে।
নিশ্চয়ের যাতায়াতে তোর
কম্র কায়া কোমল-কঠোর,
ক্ষণে ক্ষণে অধিক উতলা।
ভয় নয়, কম্প্র বিপর্যায়
অভিব্যাপ্ত তোর মহিমায় :
পাব তোকে আয়ত্তে, সরলা॥

(যে-নিপট অকপট, তাকে
প্রযত্নের পরাকাষ্ঠা দেয় ;
সে অচ্ছোদ চোখে জেগে থাকে ;
রক্ষা পায় সুন্দরের গেহ
তার দম্ভে, মতিভ্রমে. সুখে।
এসো, শিখি দুর্দৈবের মুখে
সাধ্বীদের দুঃসাহস দেওয়া।—
পারদর্শী সে-কলাকৌশলে,
পরিচিত আমি প্রতিফলে :
চিত্তজয় সবুরের মেওয়া॥)

অতএব দীপ্ত মুখমদে
বোনা যাক লঘিষ্ঠ শৃঙ্খলা :
জাড্য ভুলে, অস্পষ্ট বিপদে
স্নিগ্ধ ঈভ্ পাতে যেন গলা !
নীলিমায় অভ্যস্ত কেবল,
উর্ণাজালে পর্যস্ত বিহ্বল,
কী শিহর শিকারের স্কে !
কিন্তু নয় অগোচর কূট,
এবং তা নির্ভার, অটুট,
রচনার রীতিজ কুহকে ॥

উপহার দে তাকে, রসনা,
সোনা-মোড়া কথার মাধুরী,
লক্ষ, লক্ষ মৌনের তক্ষণা,
কিংবদন্তি, উল্লেখ, চাতুরী।
লাগ তার অপচিকীর্ষায় ;
তোষামোদে তাকে নিয়ে আয়
অভিপ্রায়ী আমার কবলে :
স্বর্গচ্যুত নির্ঝরের মতো,
নিজেকে সে করুক দুর্গত
অতটের নীলিম অতলে ॥

রোমে, নাকি পরাগে, আবৃত,
কম্বুনিভ, সে-আশ্চর্য কানে
নিরুপম কী গন্ধে পিহিত
পরমার্থ ঢেলেছি সমানে !
ভাবিনি সে-চেষ্টা অপচয় ;

সর্বগ্রাহী সন্দিগ্ধ হৃদয় :
সিদ্ধি স্থির ; শুধু প্রয়োজন,
মর্মান্বেষী মধুপের মতো,
ঘিরে রাখা নির্বন্ধে সতত
কর্ণিকা বা সুবর্ণ শ্রবং ॥

ধীরে বলেছিলুম, "নিশ্চয়ে
দৈববাণী ন্যূনতম, ঈভ্।
ওই পক্ক ফলের আশয়ে
বিস্ফারিত বিজ্ঞান সজীব।
শুনো না সে-প্রাচীনের মানা,
যার শাপে পাপ দন্তহানা।
কিন্তু স্বপ্নে মুগ্ধ ওষ্ঠাধর,
তুমি করো সে-রসের ধ্যান,
আগামীর সেই অভিজ্ঞান
বিগলিত অনন্তে উর্বর" ॥

আবেদনে অক্ষুত আমার
বক্তব্য সে পান করেছিল ;
উপেক্ষিত দেবদূত—তার
চক্ষু বুজে ঘুরে মরেছিল।
অনিষ্টের সঞ্চারে গর্ভিণী,
বোঝেনি সে-বিশ্বাসঘাতিনী
কৌটিল্যে যে অন্তর প্রধান,
যার শ্লেষে নষ্ট তার ডর,
আমি পর্ণে বিমূর্ত সে-স্বর ;
তবু ঈভ্ পেতেছিল কান ॥

"আত্মা," তাকে শিখিয়েছিলুম,
"প্রতিষিদ্ধ হর্ষের বসতি ;
তোর মনে যে-প্রেমের ধুম,
তা পরম জনিতারই ক্ষতি।
অপহৃত অমৃতে মধুর,
দূরদর্শী, আদিম অসুর,
ব্যবস্থিত ক্রান্তিপাতে মৃদু,
আমি বলি, বাড়িয়ে দে হাত,
পাড় ফল ; ঘোচাতে ব্যাঘাত
হাত আছে—চাস তো, নে বিধু" ॥

মহামৌন প্রহৃত পলকে !
অর্ধবক্ষে বিটপীর ছায়া,
অপরার্ধ, রৌদ্রের ঝলকে,
ঊর্ধ্বশ্বাস কেশরের মায়া।
সঙ্গে সঙ্গে আমার উল্লাস
পেয়েছিল শীৎকারে প্রকাশ ;
হয়েছিল বিপন্ন পুলকে
শরীরের কুণ্ডলিত কশা,—
শিরোমণি পর্যন্ত সহসা
মগ্ন যেন সমুখ মাদকে ॥

দীর্ঘায়িত অধৈর্য—প্রতিভা !
অবশেষে লগ্ন উপনীত :
ব্যক্ত নব বিজ্ঞানের বিভা ;
নগ্ন পদে গতি উৎসারিত ;
স্বর্ণে নতি ; নিঃশ্বাস মর্মরে ;

যুগ্ম আলো-ছায়ার নির্ভরে
চাঞ্চল্যের কম্পিত সূচনা ;
টলমল শূন্য কুম্ভ-বৎ
উন্মুখ সে ; উদ্বায়ী শপথ ;
আপাতত অবাক্ রসনা ॥

বরদেহে প্রলুব্ধ জিজ্ঞাসা,
হারিয়ে যা অভীষ্ট সম্ভোগে।
তোর পরিবর্তনপিপাসা,
ভঙ্গিমার সম্বদ্ধ উদ্যোগে
ঘিরে যেন রাখে মৃত্যুতরু !
না এগিয়ে বাড়া করভোরু,
গোলাপের ভারে মন্দগতি।
নৃত্যে তনু নিশ্চিন্তে সঁপে দে।
এখানে যা ঘটে, অনির্বেদে
অহৈতুক তার পরিণতি ॥

জ্বেলেছিল কী উন্মত্ত আলো
অসুর্বর বিলাসের জতু !
তবু দেখে, লেগেছিল ভালো,
পৃষ্ঠদেশে অবাধ্য বেপথু।
ইতিমধ্যে স্বপ্নে আলুথালু
বোধিক্রম, বিলায়ে রসালু
প্রপঞ্চ ও সংহৃত প্রমিতি,
ডুবেছিল রৌদ্রের গভীরে,
বাতাহত নির্ভার শরীরে
জমে যাতে আবার প্রতীতি ॥

আষাঢ় ১৩৬১

বৃক্ষ, মহাবৃক্ষ, দুর্নিবার
বৃক্ষশ্রেষ্ঠ, গগনদর্পণ,
মর্মরের দৌর্বল্যে তোমার
তৃষ্ণা করে রসানুসরণ ;
শূন্যে তুমি ছড়াও যে-জটা,
অন্তরঙ্গ তমিস্রার ঘটা
সে-ধাঁধায় মোক্ষ খুঁজে পায় ;
চিরন্তন প্রভাতের নীলে,
পারাবতে, সৌরভে, অনিলে,
অফুরান প্ররোহের দায় ॥

হে গায়ক, খনির অগাধে
লুক্কায়িত তোমার নিপান ;
যে-ভাবুক ফণীর প্রসাদে
ভাবাবিষ্ট ঈভ্, মহাপ্রাণ,
তুমি তার হিন্দোলা ; তোমাকে
উপদ্রুত করে জ্ঞান, ডাকে,
দৃষ্টিপাত বাড়াতে, উন্নতি ;
অবিমিশ্র হিরণ্যে উদ্বাহু ;
প্রশাখায় কুয়াশার রাহু,
পক্ষপাত পাতালের প্রতি ॥

বিনির্মিত তোমার বর্ধনে
অনন্তকে তুমিই হটাও ;
শীর্ষে নীড়, সমাধি চরণে,
জ্ঞানে আত্মবিলোপ ঘটাও।
কিন্তু আমি প্রবীণ দাবায় ;

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৪

হৈমার্কের বিশুষ্ক আভায়
তোমার এ-শাখা ঘিরে থাকি ;
জানি তুমি বিত্তে ভারাতুর—
বিপর্যায়, হতাশা, মৃত্যুর
চ্যুত ফল চোখে চোখে রাখি ॥

সুশ্রী সর্প, দুলি ইন্দ্রনীলে,
তন্দ্রা শিষ্ট শীৎকারে তাড়াই,
জয়যুক্ত খেদের নিখিলে
বিধাতার গৌরব বাড়াই।
দুরাশার তিক্ত মহাফলে
মৃৎসন্ততি মাতে দলে দলে—
এর তৃপ্তি, তাই বিলক্ষণ।
তত ক্ষণ তৃষাক্ষীত আমি,
সর্বেসর্বা নাস্তির প্রণামী
না যোগায় সত্তা যত ক্ষণ ॥

পতঙ্গ

সৌম্য মিত্র

(one thing is certain that life flies...)

তন্দ্রাতুর অপরাহ্ণ: অবসন্ন আলো
শেষবার বুঝি তার পরশ বুলালো
বিস্তীর্ণ মাঠের বুকে। শিমূলের ডালে
লেগেছে আরক্ত রোদ শীতের বিকালে।
চড়ুই শালিক ঘরে ফিরে এলো, চিল
আসে নেমে, কালো হোলো কাকচক্ষু ঝিল।
নারিকেল পাতা কাঁপে, অলস বাতাস
ছুঁয়ে যায়, ঢেউ দেয় হিল্লোলিত ঘাস।

কতোদিন চলে গেছে : চলে যায় দিন—
বিচিত্র ময়ূরপক্ষ ধূলায় বিলীন।
হলুদ বিবর্ণপাতা হঠাৎ হাওয়ায়
দিক হতে দিগন্তরে উড়ে চলে যায়।
কী হবে না-ই বা জানি, মাটির সংসার,
দণ্ড দুই আছে তবু তোমার আমার।

দুটি কবিতা

মুনলিট সনাটা

লোকনাথ ভট্টাচার্য

ভোরেরা এখানে নেই, এখনো কাকলী নয়—
অকারণ কোনো হাওয়া কথনো কেন যে তবু
কী-খুশির কথা কয়:
তুমি ব'লে ভ্রম হয়।

চেয়ে এই জ্যোৎস্নায় এ-কথাই মনে হয়,
কোথাও কবিতা নেই মনের মতন—
ঘুমন্ত পাহাড়ে তবু ঝরণা নীরব নয়,
সেই সুরে জেগে যায় যে-বীণা গোপন।

ভোরেরা এখানে নেই, পিয়া পরদেশ,
হয়তো কাকলী আছে অচেনা দিগন্তে—
চেয়ে এই জ্যোৎস্নায় এ-কথাই মনে হয়,
তোমার বিরহ বাজে অন্তরে অনন্তে।

আর এক বসন্ত

বেঁচে আছি—ভালোবাসব বলে
যে-ভালোবাসার গন্ধে দুঃস্বপ্ন বিবর্ণ হয়
ভোর জাগে অন্ধকার সমুদ্রের কোলে
অন্তহীন হৃদয়ের ছোঁওয়া-মাখা কী এক বাতাস
কোন দূরান্তর হ'তে ছুটে আসে ভৈরব আশ্বাসে
খাল-বিল-জলা-নদী সব মিলে যায়
আশ্চর্য অশ্রুতপূর্ব মোহানায়—

ঘৃণা করি—বেঁচে আছি ব'লে
যে-ঘৃণা তরল যেন ফুটন্ত গরল হ'য়ে ছোটে
স্বার্থপর কীটাণুর পরে রণ-রনন কল্লোলে যুগান্ত-সন্ধ্যায়
ওই পশু-মৃষিকের মরণ-মাখানো লাল আকাশে ঘণায়—
কোন তীরে ম'জে আছে অজস্র বালুর খেতে
আগামীকালের ফুলবন
তার সুপ্ত সম্ভাবনা
হু হু ক'রে উড়ে যায় নিঃসময় প্রান্তরের হাওয়া
ব'লে যায় জাগল না
—আজো সে কি জাগল না ?

আপনার সুর

আলোক সরকার

তার কথা কারুকে বলিনি।
বলবো না কখনো। এই বিকেলের আলোর রাস্তায়
একসাথে যারা হাঁটে বন্ধু-প্রিয়জন যারা যায়
তাদের আনন্দে মিশি দুঃখে এক হই। তবু দূর
আমার মনের কথা কেউ জানবে না।

কোথায় উদাস বাজে অবিরল আপনার সুর
মাটির মিলনী-মন্ত্রে পথ অতি-চেনা।
স্তব্ধতার নিরালোকে অনাসক্ত চেয়ে চেয়ে দেখি
পথের বাঁকের ফুল ধুলো ওড়ে নতুন হাওয়ার
আমি তার কেউ নয় আনন্দের উধাও পাখার।
কেন চুপ ক'রে থাকি বন্ধুরা কখনো জেনেছে কি ?

সম্পূর্ণ শিল্পকে দেয় আরো ছায়া তারা ফুরাবে না
প্রতিটি ক্ষণের দান দিনে-দিনে পুষ্পিত-মধুর।
কল্পনার নানাবর্ণ। নিবিষ্ট মুহূর্ত তপ্ত স্বর
আবার সম্মোহ আলো—পাশে কেউ নেই। কারা নেই !
কথা বলি কিছু শুনে না-শুনেও হয়তো বা। দূর
বিচ্ছিন্ন চেতনা-মগ্ন অবিরল সুর অন্যমনা।

বলিনি কারুকে তার কথা বলবো না।

দুটি কবিতা

ভিতর এলাকা

সুনীল সরকার

'অনিত্যমসুখং লোকম্'

সংসার দেখায় বেশ সুস্থ সপ্রতিভ :—
অগোণে এগোয় যেন জয়ন্তী-দিবসে,
বাড়ী ওঠে, পথ হয়, অপ্সরী-সন্নিভ
মেয়েরা বেড়ায় ; হাট, রাজ্যপাট বসে,
কাজ রপ্ত হয়, ফের সুতা-ছেঁড়া ভিড়,
গড়িয়ে ছড়িয়ে পায় নিজ নিজ নীড় :—
নিখুঁত, নিপুণ সব।
এই চিরকাল
গ্রাহ্য হয়, ইতিমধ্যে যদি-না দৈবাৎ
উৎকণ্ঠার হাওয়া ওঠে, হৃদয় গোঁয়ায়,
আস্ফুরিত বিলাপের নির্বার নির্ঘাত
বিদ্যুতে আকাশ ছিঁড়ে উলঙ্গ উত্তাল
ঘুমন্ত সমুদ্র জাগে—তারি কিনারায়
উচ্চ হতাশার মারে অশ্রুপঙ্ক মাথা
দেখা যায় সংসারের ভিতর-এলাকা।

নটীর পূজার নটী

মন রে, হবি নটীর পূজার নটী ?
একে একে খুলে ফেলবি সাজ
চিন্তা-মালা, কীর্তি-সিঁথি,
ভাব-উড়ানি, আঁচল, কাঁচল,

বুকের কাছের সূক্ষ্ম সূচি-কাজ,
তারো নীচে আপনা-জানা
আ-রঙা আঙরাখা খানা
খসিয়ে দিবি, লুটিয়ে দিবি আজ ?
আলগা ক'রে বুকের তট, কটি,
হবি কি আজ নটীর পূজার নটী ?

দেখরে ফোটে আকাশপর্দা ছিঁড়ে
পূজারিণী নগ্ন নটীর নাচ,
ম'রে বাঁচার লহর ওঠে,
মৃদঙ্গ তাই মাথা কোটে,
গ'লে মিলোয় প্রাত্যহিকের ছাঁচ।
হৃদয়গলা এই সাগরে
শতদলের মতন ক'রে
নিজেকে তোর ঢেউয়ে তুলে বাঁচ।
কে আজ এসে ধ'রেছে তোর কটি,
হ' দেখি মন নটীর পূজার নটী !

আত্মচেতনাকে

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা

(তাহলে ব্যর্থই হব আমি।
যদি কোনো দ্রুতগামী
পাখিদের পরিশ্রান্ত ডানা,
আচম্বিতে পেয়ে যায় জীবনের মুক্তির মোহানা ;
তবুও সে ব্যর্থতার গ্লানি
দগ্ধভালে পরাবে ভস্মের টিপ। যদিও একথা মানি :
আমার যা কিছু ছিল সামান্য সঞ্চয়
লগ্নির কারবারে সে তো বৃথা অপচয়
আমিই করেছি। অবশিষ্ট যতটুকু দেনা
এ মনের শূন্য অঙ্কে ব্যর্থতার মূল্য শুধবে না ?
ক'খণ্ড অঙ্গার স্মৃতি
হৃদয়ের উপকূল ঘিরে তার শেষ অনাবৃতি
রেখে যাবে ? শুধু তার ছলনার প্রেম
মুছে দেবে ভালোবাসা ; গোধূলির নিকষিত হেম ?)

*

যে-হাসি একদিন জলতরঙ্গের
নূপুরনিক্কণে তুলেছে ঝংকার ;
যে কথা একদিন প্রলাপী বাতাসের
হৃদয় ছুঁয়ে গেছে করুণ শংকায়
কান্না ছলোছলো যে-দুটি ম্লান চোখে
কেঁদেছে শ্রাবণের মিঞাকী মল্লার,

সে-হাসি কথা আর সে-মৃদু কান্নার
করুণ প্রতিলিপি খুঁজলে পাব না তো।
তাহলে কেন বল সকালে রোদ্দুরে
চায়ের পেয়ালায় হাসির স্বরলিপি।
সবুজ ঘাসে ঘাসে ছড়ানো বাদামের
টুকরো রেখে যায় সে কোন কথাদের
অবাক কারুকাজ। বিকেল ধরো ধরো
দুপুরে জানালায় দাঁড়িয়ে একা একা
সে-কোন অভিমানী মেয়ের দুটি চোখে
ব্যথায় ভিজে ভিজে কান্না থমকায়।

*

তাহলে বুঝি সব কথারা আছে
অন্য কোথা অন্য কোনো মনে।
তাহলে বুঝি এই হৃদয়ের কাছে
আরেক মন হাওয়ার ভাষা শোনে।
ফ্ল্যাটের ঘেরা বারান্দায় নাচে
আরেক হাসি টুকরো কত কথা।
বিকেল রোদ্দুরের রঙে সাজে।
আকাশী মাঠে একী এ আকুলতা।
মুক্তো চিকচিকে সে দুটি দুলে
আলোর মৃদু প্রণয়লিপি আঁকা
কত মুখের মিছিলে গেছি ভুলে
তার সে দুই ধনুক ভুরু বাঁকা।
এখনো সে কি আগের মতো আছে
আকাশে চোখ রেখে কপাট ছুঁয়ে

আষাঢ় ১৩৬১

বুঝি সে-মন ঝাউয়ের গাছে গাছে
ঢেউ তুলেছে কী যে ব্যথায় নুয়ে।
তাহলে আমি পুরনো পট মুছি
মনের রঙে আরেক ছবি আঁকি।
তার সে সাদা সিঁথির পথসূচী
খুঁজবো আমি ভরবো সব ফাঁকি।

*

স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত পাহাড়ের উৎকীর্ণ সে লিপি
মুছে যায়। আরেক মায়াবী হাত সান্ত্বনার আশ্চর্য প্রলেপে
ধুয়ে দেয় বেদনার সে তাম্রশাসন। অবাক, অবাক লাগে
কোথা থেকে আসে এই অসহ্য দুঃখের মতো
থরথর নিমীলিত সুখের যন্ত্রণা। বেদনার খনি খুঁড়ে
বুঝি খুঁজে পাই।
স্বেদগর্ভ শ্রমে মোড়া একমুখ আলো-করা হাসি
আমি তবে মুঠো মুঠো বেদনাকে মেখে নিই
আরেক সমুদ্র স্নানে। এ বন্দর যদি পলাতক
হয় কোনো ছলনার কুয়াশায় ঢেকে :
আবার নাবিক মন
পাড়ি দেবে অন্য কোনো দ্বীপে চোখ রেখে।

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৪

ওয়ার্ডস্‌ওঅর্থের প্রতি

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী

তোমাকে আমার ভালো লাগতো না। শব্দের মৌমাছি
পাথার গুঞ্জন তুলে করেনি বিহ্বল নাচানাচি।
রক্তের মতন লাল হৃদয়ের চোলানো আবেগ,
পাইনি, পাইনি স্বপ্ন, ভেসে-যাওয়া লঘুপক্ষ মেঘ।
হেসেছি, তোমার হাতে প্রাগৈতিহাসিক একতারা।
মুরজ, মুরলী, বীণা সভায় বাজ্‌বে কতো ধারা!
সেই সব অত্যাশ্চর্য বাজনার সাথে সাথে, কতো
আকাশে যে উঠ্‌লাম, জ্বল্‌লাম আগুনের মতো।
গোলাপের মূর্ছা আর চাঁপার নেশায় ডুব দিয়ে
ক্লান্ত মনে ফিরলাম চেতনার তীর হাতড়িয়ে।
ততোক্ষণ শ্বেতশ্মশ্রু, শাদাসিধে প্রসন্ন বাউল
একতারে অবিশ্রাম চালিয়েছো নিঃশব্দ আঙুল।
আকাশের প্রান্তে আঁকা রামধনু। একলা কৃষাণী
গান গায়। ইআরো-র জলে-ধোয়া উপত্যকাখানি।
একটি সহজ মেয়ে, আধো-ঢাকা ভায়োলেট ফুল,
এই সব মেঠো সুর বাজিয়েছে তোমার আঙুল।
আমারো মনের ঝড় থেমে যায়। স্তব্ধ হয়ে আসে
যে-মূর্ছনা, যে-প্রলাপ ছেয়েছিল আকাশে বাতাসে।
বাজাও, বাজাও তুমি মেঠো সুরে বাউলের বীণ।
সাধ যায় কান পেতে শুনি তার ক্ষীণ রিণ রিণ।

অধ্যায় শেষ

অন্নদাশঙ্কর রায়

১

জেনেছি যা তারে না জানতে চাই
শুনেছি যা তারে না শুনতে, ভাই।
করেছি যা তারে না করতে চাই
বলেছি যা তারে না বলতে, ভাই।

গোড়ায় যদি না জানতেম তারে
থাকতেম ভালো অজ্ঞাতসারে।
আদৌ যদি না শুনতেম তারে
থাকতেম ভালো নীরবে নিসাড়ে।

এখন যে দেখি ভোলা নয় সোজা
দেখে শুনে পরে চোখ কান বোজা।
বাকা ছুটলে ফিরবে না মুখে
গুলী ছুটলে কি ফেরে বন্দুকে!

২

ইচ্ছা যেখানে উপায় সেখানে
ও কানে ঢুকেছে বেরোবে এ কানে।
ইচ্ছা আসল। ইচ্ছা আছে কি?
মনের অতলে ডুব দিয়ে দেখি।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হব না কিছুতে
ফিরে তাকাব না কখনো পিছুতে।
সাধনা আমায় দিয়েছে ভারতী
আমি কেন হই পার্থসারথি!

দুনিয়ায় আছে হরেক মন্দ
তাই বলে আমি করব দ্বন্দ!
মন যার নেই সৃষ্টির কাজে
মন্দই তার নয়নে বিরাজে।

৩

মন্দের কবে হবে অবসান
কল্যাণময় নয় এ ধেয়ান।
মন্দের সাজা হবে নিশ্চয়
নয় এ চিন্তা কল্যাণময়।

আমি ভালো আর অপর মন্দ
কল্যাণময় নয় এ ছন্দ।
সৃষ্টি যে করে চেতনায় তার
অকল্যাণের সয় নাকো ভার।

বিধাতাকে দিই বিধাতার দায়
তাঁর দায় আর আমার বিদায়।
আমার ভাবনা লক্ষ্যভেদন
তন্ময় হব শরের মতন।

৪

আঘাত পেয়েছি যেন ভুলে যাই
মুক্ত হয়েছি, সত্য এটাই।
আঘাত না পেলে মুক্তি কে চায়
লক্ষ্যের পানে দৃষ্টি কি যায়!

ভালোই হয়েছে পেয়েছি আঘাত
নইলে চলত নিত্য ব্যাঘাত
বিচ্যুত হয়ে স্বকর্ম থেকে
অকর্ম নিয়ে সুখী হয়েছে কে!

বিধাতার কৃপা আপাত কঠোর
পরে বোঝা যায় প্রয়োজন ওর।
মুছে যাক তবে খেদ বিদ্বেষ
এই অধ্যায় হোক নিঃশেষ।

নির্জন দিনপঞ্জী

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

৩রা বৈশাখ সকাল॥

আকাশ জেনেছে, মাটিও শুনেছে অমি-যে করেছি আত্মগোপন!
আমি আজ তাই প্রবাসী আকাশে
হাওয়ায় হাওয়ায় ঘাসে আর ঘাসে
নিজের মনের নিরালাবৃক্ষ করব রোপণ;
পিছনের যারা পিছনেই থাক,
শুনব না আর কারো পিছুডাক—
সাড়া-না-দেবার শপথ না হয় না হোক শোভন।

রাত্রি॥

ছুটি মাত্র দুটি দিন, তারপর শহরের ঋণ
তিলে-তিলে আমাকেও শুধে দিতে হবে;
হে মৃত্তিকা, হে আকাশ শেষবার কথা রাখো তবে,
আমার দু-হাতে দাও দুটি দিন প্রতিশ্রুতিলীন:
একটি ভাস্বর হোক্, যে আমায় বিপুল বৈভবে
নীরবে উত্তীর্ণ করে—আরেকটি অঙ্গারমলিন
হোক্, তাতে ক্ষতি নেই, আমার অতন্দ্র কোনো প্রতীক্ষার পূর্ণ প্রণিপাতে
হৃদয়ের সহচর সময়ের হাতে
যে অঙ্গার অবশেষে হীরক হবেই।

৪ঠা বৈশাখ, ভোর॥

এই সকালের আড়ালে কি কোনো তামসী রাতের
অন্ধকারের প্রস্তুতি নেই?

নির্জন থেকে জন্ম যে-সব সোনালিমায়ার কুহেলিকাদের
এ-সকাল মাতে তাদের সঙ্গে প্রদক্ষিণেই !

শ্বেতকরবীর বুক জুড়ে ওই একটি শালিক
বসে আছে যেন ঐন্দ্রজালিক।

আর তাই বুঝি ঈর্ষাপ্রখর প্রজাপতিটার
মাতাল পালকে হাওয়া ছুঁয়ে যায় চপল গীটার—
আমারো চিন্তা আমারো অঙ্গ
হোক তবে আজ হাওয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ।
সেই হাওয়া ফের ছোট্ট দীঘির
শাপ্‌লায় গড়ে নিলাজ খুশির নিপুণ শিবির
আবার হঠাৎ আড়ালে বাজায় জলতরঙ্গ,
সেই সুর নিয়ে ছিনিমিনি খেলে
রোদ্দুর আঁকে জলছবি নয়, জীবনের ছবি জলের ইজেলে—
হোক্ তবে আজ আমারো চিত্ত আমারো অঙ্গ
জলের সঙ্গে আলোর সঙ্গে অন্তরঙ্গ।

নিরালা নিখিল, সব-কিছু দাও,
মৃত্যুর সুরা, জীবনসুধাও,
আর তারপরে দ্বিগুণ অর্ঘ্য অর্চনা নাও।

দুপুর ॥

সারাদিন আমি এক দুর্বিষহ রহস্যের পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছি একা। যে আমাকে দূরের প্রবাসে
নির্বাসন দিয়ে সুখী, দীপ্ত সেই রহস্যময়ীর
চেয়ে বুঝি এ-রহস্য আরো গাঢ় অতল গভীর,

এবার আমাকে তাই কিছুতেই মুক্তি দেবে না সে,
আমি তার নদী আর সে আমার নম্রনদীতীর ;
নম্র সে, নিষ্ঠুর তবু আমাকে সর্বদা ঘিরে রাখে,
আমি যদি যেতে চাই দূরতর সাগরের ডাকে,
আমার অনন্ত গতি সীমন্তে সিঁদুর ক'রে আঁকে।

ওখানে আশ্চর্য এক দরদী নদীর
বুকের দর্পণে দোলে পুরাতন দ্বাদশ মন্দির।
আমারো হৃদয় এক নদী,
আমার জীবন তবে এখনো হলো না কেন মন্দিরের মতো মহাবোধি ?

মন্দিরের পাশে এক মাঠ,
দিগ্বলয় হতে আরো আরো দীর্ঘ মনে হয় যাকে,
হাট বসেছিল কাল, আজ তার বিষণ্ণবিরাট
শূন্য বুকে ঘুরে মরে একা একটি মা হারা বাছুর,
সমস্ত দুপুর
খুঁজেছে সে মাকে,
তারপর শুয়ে আছে বটের ছায়ায় মৌন রৌদ্রভারাতুর।

বিকেল ॥

উদাসীন মেঘে মেঘে ফুটে আছে থোকা-থোকা
আরক্তকরবী :
সমস্ত আকাশ যেন গগনেন্দ্র ঠাকুরের ছবি।
ধানকলে কাজ সেরে এইবার ঘরে ফেরে
সাঁওতালি মেয়েরা ঝাঁকে ঝাঁকে,
দাদারিয়া গানে-গানে সে-করবী তুলে আনে
খোঁপার ফণায় গুঁজে রাখে।

ভিড় থেকে স'রে আসি প্রবাসী আকাশে,
তবু কেন তার মুখ ভিড় ক'রে আসে ?
আরো দূরে পাহাড়চূড়ায়
দুই চোখ ডানা করে মেলি,
ওখানে কে ব'সে আছে ? আমারই বেদনা যেন চন্দনরাঙানো লালচেলি,
ওই তো রাজর্ষি সূর্য দিনশেষে শরীর জুড়ায়,
মৃত্যুতে মরে না, সে যে নব সবিতার তেজে
দীপ্তি পায় দিন থেকে দিন,
আমার বেদনা তবে এখনো হলো না কেন সূর্যের মতন সমাসীন ?

সন্ধ্যা ॥

কে ছড়ালো এই দুঃসহ মহানিশি ?
বিনিদ্র চোখ, নীরন্ধ্রে, নির্জনে
বাসনার বুড়ি ডাইনী গেল না সুদূর নির্বাসনে ?
অশান্ত মন। দিগন্তে তবু অপূর্ব উদাসীন
আপন আলোর পা-ঙ্কেলীন সুপ্ত সপ্ত ঋষি !

ভোর সকাল ॥

গতরাত্রি গেছে যন্ত্রণায়,
বিগত শোকের শিল্পী আকাশের কোনায় কোনায়
সোনার মাধুরী ছিঁড়ে শ্রাবণের মেঘের মতন
কুটিল কাজল আঁকলো। হে নির্বাক ওগো নিরঞ্জন,
তোমার প্রতিভূ যেন এইবারে ভৈরবী শোনায়।

দুপুর ॥

মাঠে-মাঠে ওই ঝুমুর ছন্দে কাঁপছে চাষীর জীবনশৈলী
ওরে মন, কেন গেলিনে সেখানে, নিজের মনের গোপনে রইলি ?

ভুলে গেলি কেন কথা ছিলো তোর সবার সঙ্গে অঝোরে মিল্‌বো :
সেই-তো আমার স্বর্গসাধন, সেই-তো আমার জীবনশিল্প !

বিকেল ॥

অজ্ঞাতবাসের সঙ্গী আমার দুজন—
একজন কোন্‌ এক দূর গাঁয়ে সতীশের পিসী,
আমাকে ভেবেছে তার পরম সুজন,
অতএব মেনেছে সালিশী :
সকলেই চেনে তার ভিটা,
সন্নিহিত ইঁদারার পাশের জমিটা
একান্ত নিজস্ব তার—পাড়ার সবাই সেটা জানে,
অথচ পিসীর সঙ্গে সতীশের কলহ সেখানে !
কোলে-পিঠে গড়ে-তোলা সে-ই কিনা হিংসার প্রতীক ?
সুতরাং সে-জমির কোন্‌জন আসল শরিক ?

অন্যজনা সাতাত্তর বছরের বুড়ি,
যেন এক প্রাণবৃক্ষ জীবনে জীবনে শতঝুরি
ছড়িয়ে এখন ভাবে গুটিয়ে নিলেই ঠিক হতো,
কারণ আজন্ম তার পুজো আর ব্রত
ব্যর্থ ক'রে ভগবান একমাত্র বয়স্ক ছেলেকে
নিজের স্বর্গের স্বার্থে নিয়েছেন ডেকে ;
যখন ওপারে গেল একষট্টি বয়স ছিলো তার,
বিধাতার কাছে গেছে, বুঝিয়েছে এ-গাঁয়ের লোক,
কি-ক'রে ভুলবে সে তবু একে-একে একষট্টি বছরের শোক
শিরায় শিরায় যার সাতাত্তর বছরের ভার ?

৩

আমি তাকে কি বোঝাই ; তাকে আমি বলিনি কিছুই,
সে যখন ফিরে গেল নিরালা নীলিমা জুড়ে
আমার শোকের পাশাপাশি,
তার সেই শোক রেখে আমি,
অপার আনন্দ নিয়ে তারপর দুজনারে ছুঁই।
এই রাত্রি গাঢ় হোক তারপর দুটি শোক
খুঁজে নিক্ বীতশোক বীণ—
হে নির্বাক নিরঞ্জন তারপর এ-জীবন
করে দাও সূর্যসমাসীন।

সেই সান্ত্বনা হয় যেন ধ্রুব :
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

দুটি শেষের রাত্রি।

আবার সেই ম্লান সহর, কালো গলি,
স্তিমিত গান, ওখানে যেন কোনো অসুখ
দুহাতে এসে ফেলেছে ঢেকে দিনের মুখ ;
কলকাতায় ফিরে চলি।
তবু নিলাম দুটি দিনের দুঃখসুখ,
নিরিবিলির ছায়ানিবিড় কথাকলি,
চূর্ণ হোক কলকাতার কালো গলি :
ব্যথার কুঁড়ি গানের ফুলে ফুটে উঠুক ॥

প্রতারণা

হুমায়ুন কবীর

কাছের পাহাড়ের গায়ে সবুজ ঘাসের আস্তর,
দূরের পাহাড়ের মাথায় পাইনের সারি
যেন হাজার মন্দিরের চূড়া।
মাঝখানে বয়ে চলেছে ছোট পাহাড়ি ঝর্ণা,
যতটুকু তার জল তার চেয়ে বেশী কলরোল।
ঘাসের আচ্ছাদন নিস্পন্দ।
দেখে মনে হয় যেন প্রাণহীন,
গভীর প্রশান্তি যেন ছড়িয়ে রয়েছে পাহাড়ের গায়ে।
দূরের পাইন স্তব্ধ ধ্যানমূর্তির মতন দাঁড়িয়ে,
বাতাসে পাতাটুকুও নড়ে না,
মনে হয় সমস্ত পৃথিবীর স্তব্ধতা
এখানে এসে জমাট বেঁধে গেছে।
বিরাট স্তব্ধতা এবং শ্যামল প্রশান্তির মাঝে
একটুখানি চঞ্চলতা এনেছে খালি ঝর্ণার জলের ধারা।

হঠাৎ মনে পড়ে কত বড় মায়ার খেলা চলেছে এখানে।
পাইনের স্তব্ধতা ছদ্মবেশী,
তারই আড়ালে চলেছে বাঁচবার কী নিষ্ঠুর সংগ্রাম।
কঠিন পাথর ভেদ করে যেখানে মাটীর একটুখানি কণা
তার রস নিঃশেষ ক'রে পাইনগুলির বাঁচবার কী কঠিন প্রয়াস!
শিকড়ে শিকড়ে সে কী জীবনরসের জন্য কাড়াকাড়ি,
একে অপরকে ছাপিয়ে উঠে
আলো পাবার কী আকুলতা!
ঘাসের বনেও জীবনের সেই দুর্নিবার ক্ষুধা।

আষাঢ় ১৩৬১

প্রতিটি ঘাসের শিকড়ে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা,
দূর্বাদলের শ্যামল আচ্ছাদনের প্রতিটি তৃণ
অন্ত সবাইকে বঞ্চিত ক'রে আলো-জল-বায়ুর পিয়াসী।
দেখতেই শুধু পাইনতরু স্তব্ধ সমাধিমগ্ন,
দেখতেই শুধু ঘাসের কোমল গালিচায় সবুজ প্রশান্তি।
ঝর্ণার জলধারার চঞ্চলতার মধ্যে রয়েছে প্রাণের আভাস।
সেখানে সংগ্রাম নেই, সেখানে আছে গতি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে মাখামাখি,
জলের কণায় কণায় ঠেলাঠেলি,
দুরন্ত আবেগে শুধু সামনে ছুটে চলে।
কঠিন পাথরকে ভিজিয়ে,
শুকনো মাটীকে সরস ক'রে,
রুক্ষ শিকড়কে প্রাণের রস জুগিয়ে,
পৃথিবীর চারিদিকে প্রাণ ছড়িয়ে,
সমস্ত প্রশান্তির মধ্যে জীবনের চঞ্চলতা এনে,
সবুজ ঘাসের গালিচা বেয়ে,
পাইনের মৃত্যুশীতল সবুজ অন্ধকার ভেদ ক'রে,
বর্ণহীন অথচ হাজার বর্ণে বিচ্ছুরিত জলের ধারা
দিবারাত্রি কার আহ্বানে
কোথায় ব'য়ে চলে ?

গুলমার্গ। ২২ জুন ১৯৫৪

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৪

তিনটি কবিতা

শোভন সোম

১

এক ঝাঁক শিশু খুশির খেলায়
মুঠো মুঠো রেণু ছড়ায় হেলায়
শাখায় শাখায় কল-কলরবে
মেতেছে প্রাণের মহা-উৎসবে।
এক ঝাঁক শিশু যেন আলোকের তূণ থেকে ছুটে
শাঁ শাঁ রব তুলে জীর্ণ পাতার ক্ষীণ করপুটে
ছড়ায় আবির নতুন পাতার, খেলে সারাদিন
এক ঝাঁক শিশু গোটা পৃথিবীর শোধ করে ঋণ॥

২

এক শ্রাবণের বৃষ্টির কত স্রোতের সঙ্গে
আমাকে কখন হারিয়েছিলেম, বিপুল রঙ্গে
খেলার মাতনে—তাথা থৈ থৈ সে কী উচ্ছ্বাসে বাজিয়েছিলেম কত করতালি
এক শ্রাবণের বৃষ্টির শেষে পড়ে আছে শুধু চোখ-ধূ ধূ বালি॥

৩

একটি কথার স্পন্দন লেগে বুঝি কারো মনে
অজস্র ঢেউ তুলেছিল ফণা
হৃদয় নিভৃতে কখন গোপনে
পিলসুজে পুড়ে ছাই হয়ে গেছি, কেউ জানলো না॥

আষাঢ় ১৩৬১

সমুদ্রের প্রতি—জাহাজ থেকে

বুদ্ধদেব বসু

আমিও তোমার মতো নিঃসন্তান হয়েছি এখন।
তীর নেই, শস্য নেই, নেই পল্লী, কুটির, কানন।
শুধু ঢেউ, চঞ্চলতা ; ফুলে-ওঠা দীর্ঘশ্বাস আর
সকল দিগন্ত জুড়ে ক্ষমাহীন ক্ষুধার বিস্তার।
যেন কোন জন্মান্তরে চিরন্তনী পরান-প্রিয়ারে
পেয়েছিলে ঈশ্বরের হাত থেকে এই অঙ্গীকারে,
'যারে ভালোবাসো তারে ছেড়ে দিয়ে চ'লে যেতে হবে।'
তাই আর শান্তি নেই। তাই চাপা-কান্নার তাণ্ডবে
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে উতরোল প্রতিবাদ। তাই হাহাকার,
তুফান, তুষার-শিলা, ডুবে-মরা নাবিকের হাড়,
হাঙরের দাঁতে-ছেঁড়া যন্ত্রণার অব্যক্ত চীৎকার—
এই সব ছেয়ে আছে তিক্ত নীল রক্তের লবণ।

আমিও তোমারি মতো সর্বস্বান্ত হয়েছি এখন।

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৪

বর্ষণ

অরুণকুমার সরকার

রাত্রি আর নয় বিরহী যক্ষ,
ঊর্ধ্বগ্রীব, আহা, স্তনময়তায়।
পেয়েছে প্রাণ আজ, জেগেছে ক্লীব-যে
বৃষ্টিধারা অব্যর্থ লক্ষ্য।

ছুঁয়েছে শব্দের স্নায়ুর কেন্দ্রে
অবাক যন্ত্রণা মলিন পুষ্প,
বিলীন জোছনার আভার ফাঁকে-যে
অর্ধবিকশিত করুণ বন্দী।

ছুঁয়েছে উন্মাদ উধাও মুক্তি
অবাক লাখ লাখ ক্ষুধিত বৃন্ত,
শুষ্ক শাখে শাখে ঝরছে বৃষ্টি
রাধার চোখে নামে কিশোর কৃষ্ণ।

ঝরছে অবিরাম মুখর শব্দে,
অর্থ আর নয় সুদূরবোধ্য,
প্রস্ফুটিত ফুলে, বস্তুপুঞ্জে,
ঊর্ধ্বগ্রীব, আহা, স্তনময়তায়!

আবির্ভাব

বুদ্ধদেব বসু

তারপর এলো দেবদূত। বই প'ড়ে, গল্প শুনে যেমন ভেবেছি
কিছু নয় তার মতো। নয় লাল তলোয়ারে আঁকা,
আগুনের পাখা নেই, নেই কোনো অলৌকিক অলংকার।

মনে হ'লো উষ্ণ, ছোটো, বাদামি, নরম এক পাখি
বছরের ঢেউয়ের ঝাপসা ফেনা পার হ'য়ে এলো,
বুকে তার কিশোর কান্নার দাগ হেমন্তে হলুদ,
অথচ ঠোঁটের ফাঁকে নীড়ের প্রথম তৃণ, বসন্তের ভার।

অসীম নির্ভরে ভরা ছোট্ট মুঠোর মতো পাখি।

আমি ছিনু শুকনো ডাঙায় প'ড়ে। যেখানে নির্জনে
পাথর, আবর্জনা মরা মাছ, শ্যাওলা শামুক
কখনো দেয় না সাড়া জাহাজের সুদূর ধোঁয়ায়,
সেখানেই পালকের স্পর্শ তার চুম্বনের মতো।
আমার কঠিন মৃত্যু হ'লো তার বিশ্রামের দ্বীপ।

—কিন্তু কেন? বিচ্ছেদের অবসান হবে ব'লে?
নির্বাসন ভেঙে যাবে ঘরে-ফেরা মুখর হাওয়ায়?
ও-কথা তারাই ভাবে যারা ভালোবাসেনি এখনো।
তার পথ অন্তহীন, যাত্রা তার যুগে-যুগান্তরে,
তাই যাকে দেখা দেয় তার কিছু থাকে না তো আর—
কেবল তৃষ্ণার তাপে কবরের মাটি ফাটে।

সেই তো উদ্ধার।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা

নরেশ গুহ

রবীন্দ্রনাথের পর যে-পুরোধা কবিদের একদা-ধিকৃত 'ঔদ্ধত্যের' ফলে বাংলা কবিতার বর্তমান জন্মান্তর ঘটেছে তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর আনুপূর্বিক কবিতাবলীর অন্তর্নিহিত ঐক্য অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। সুরু থেকেই আনকোরা আধুনিকের মন নিয়ে তিনি কবিতা লিখতে বসেননি। অথচ বিবেকবান আধুনিকের কাছে যে-শিল্পসমস্যা প্রধানতম তার লক্ষণ যথেষ্ট চড়া মাত্রাতেই 'বন্দীর বন্দনা'য় বর্তমান ছিল। এ সমস্যা পরলোক, ঈশ্বর আর অনন্তজীবনে আস্থা হারিয়ে ইহলোকেই শিল্প আর জীবনের দারুণ দ্বন্দ্বে নতুন ক'রে সমন্বয় সাধনের সমস্যা। এই সমন্বয় সন্ধানের ইতিহাসই বুদ্ধদেব বসুর কবিজীবনের ইতিহাস। এবং সেই সমন্বয় খুঁজতে গিয়ে আঙ্গিক, ভাষা, ছন্দ, উপমা উৎপ্রেক্ষা সব কিছু নিয়ে তাঁর কাব্যের চরিত্র এমন অন্বয়ান্বিত অথচ নিশ্চিত গতিতে বিবর্তিত হ'য়ে উঠেছে যা তাঁর মুগ্ধ পাঠকমণ্ডলীকেও প্রথম প্রথম এড়িয়ে যেতে পারে। পুরাতনের সঙ্গে তাঁর সংযোগের সেতুখানা তিনি একেবারে উড়িয়ে দেননি বলেই তাঁর রচনাবলী থেকে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ যে আধুনিক বাংলা কবিতার সুসংগত স্বাভাবিক এবং অনিবার্য বিকাশ কোন পথে। সেজন্য, বলাবাহুল্য, তাঁর একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ কিংবা নির্বাচিত কয়েকটি মাত্র কবিতাই যথেষ্ট নয়, কেননা বুদ্ধদেব বসু সেই শ্রেণীর কবি যাঁর এক যুগের কবিতার সঙ্গে অন্য যুগের কবিতাবলী এক সংলগ্ন ধারাবাহিকতার সূত্রে গ্রথিত। বিচ্ছিন্ন কবিতা থেকে তাঁর শুধু খণ্ডিত এবং আংশিক পরিচয়ই পাওয়া যাবে। ইংরেজ কবিদের মধ্যে ইএটস্ এই শ্রেণীর কবি। বুদ্ধদেবের 'শ্রেষ্ঠকবিতা' নামের কাব্যসংকলন থেকে পাঠকদের অন্ততঃ এইটুকু সুবিধা হবে যে এই একটি গ্রন্থেই তাঁরা সমগ্র রচনাবলী থেকে কবির নিজের নির্বাচিত বহু কবিতা কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো পেয়ে যাবেন এবং তা থেকে তাঁর কাব্যকলার আশ্চর্য বিবর্তনের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হবে না।

জীবনানন্দ দাশের কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন :

'আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সবচেয়ে কম 'আধ্যাত্মিক', সবচেয়ে বেশি 'শারীরিক'; তাঁর রচনা সবচেয়ে কম বুদ্ধিগত, সবচেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়গত।' ইন্দ্রিয়গত ভাষার ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুর নিজের রচনাতেও কিছু কম নেই। অকায় উপলব্ধির প্রকাশ করতে হলেও সচেতনভাবে তিনি সেইসব চিত্রকল্পেরই সহায়তা নিয়ে থাকেন যার ফলে তাঁর হৃদয়াবেগের কবিতাও প্রথম হানা দেয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের দরজায়। দৃষ্টান্তের জন্য পাতা হাতড়াতে হবে না :

গাছের সবুজে রোদের হলুদে গলাগলি,
পাতায়-পাতায় হঠাৎ হাওয়ার বলাবলি ;
উ কি দেয় বুকে ভীরু কবিতার ক্ষীণ কলি—
আহা, বিকেল! সোনার বিকেল! ('বিকেল')

কিন্তু উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। আমার বলবার কথা এই যে ভাষাব্যবহারে সচেতনভাবে শারীরিক হয়েও বুদ্ধদেব আধুনিকদের মধ্যে 'আধ্যাত্মিক' কবি। তিনি যে ধর্মবিষয়ে কবিতা লিখেছেন, কিংবা তাঁর শিল্পজিজ্ঞাসা যে আসলে ঈশ্বরজিজ্ঞাসার নামান্তর তা কথনোই নয়। তিনি 'আধ্যাত্মিক' এই অর্থে যে তাঁর সমগ্র কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে,—শিল্পীর সংজ্ঞা কী?—এই একটিমাত্র জিজ্ঞাসারই তিনি উত্তর খুঁজেছেন। এর চাইতে ভিন্ন কোনো আধ্যাত্মিক সমস্যা শিল্পীর পক্ষে অবান্তর সে কথা বলা বাহুল্য। আধুনিকের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর যে এমন জরুরী হ'য়ে উঠেছে তার কারণ এ-যুগের মানসিক চরিত্র সংশয়ী বিজ্ঞানের পাঠশালায় গড়া; সমাজ এবং নীতির ক্ষেত্রে চিরাচরিত মূল্যবোধের বিপর্যয় এ-যুগের সামান্য লক্ষণ। 'অগ্রজের অটল বিশ্বাস' হারিয়ে অল্পবিস্তর সবাই আমরা অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির। এ অবস্থায় বিবেকবান কবিমাত্রেই নতুন ক'রে শিল্পীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করার তাগিদ বোধ ক'রেছেন। যার পরলোক নেই, স্বর্গ মিথ্যে হ'য়ে গেছে, জৈব অস্তিত্ব যার কাছে প্রহসন মাত্র :

অবান্তর, তুচ্ছ, নিরর্থক,
পরিত্যক্ত বিবর্ণ পুতুল—
ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, আর
কয়েকটি হাড়—
এই আমি, এ-ই আমি। ('দময়ন্তী')

নিদারুণ সত্য এই আত্মপরিচয় যার পক্ষে ভুলে থাকা অসম্ভব, তিনি যদি দৈবক্রমে শিল্পী হ'য়ে থাকেন তাহলে—শিল্পী হিসেবে তাঁর কাজ কী—এ প্রশ্নের কোনো চিরাচরিত জবাবই তাঁর আজ আর কাজে লাগবে না। দ্বন্দ্বে দ্বিধায় পীড়িত, হতাশা লাঞ্ছনার হাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন, আপাত অর্থহীন, শতগ্রন্থিময়, জটিলই এই জীবনকে নিয়ে কী আমি করতে পারি? কোন আশায়, কোন আনন্দে, কিসের আশ্বাসে?—নিজের স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ প্রশ্নের উত্তর কবির নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। যুক্তিব্যবসায়ীর সিদ্ধান্ত, নির্ভুলও যদি হয়, কবির প্রয়োজন মেটাবে না। উত্তর পাবার একটিমাত্র পথই কবির সামনে খোলা আছে—কবিতা রচনা। এই সূত্রে রজার ফ্রাই কৃত মালার্মে-অনুবাদের ভূমিকায় শার্ল মোরোঁ যে-কথা বলেছেন তা অনুধাবনযোগ্য।

There is no art. There are only men who are artists, who at each moment in their lives, are their own definition.

'বন্দীর বন্দনা' থেকে 'দ্রৌপদীর শাড়ি'—এই দীর্ঘ বিশ বছর ধ'রে লেখা কবিতার ভাব-ভাষা-চিত্রকল্প এমন কি ছন্দ থেকে মনোযোগী পাঠক আবিষ্কার করতে পারবেন বুদ্ধদেব বসুর মনে শিল্পীর সংজ্ঞাটিও দিনে দিনে কি ভাবে বিবর্তিত হ'য়ে উঠেছে। তাঁর প্রেমের কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে, যিনি প্রেমিক তিনি এখানে উপরন্তু সচেতন শিল্পীও। এ থেকে তাঁর কাব্যের ভাবানুষঙ্গের অলক্ষ্য জটিলতা অনুমেয়।

'বন্দীর বন্দনা' পড়তে ব'সে কবিতাগুলি আবার নতুন ক'রে ভালোবাসলুম। মনগড়া এক বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা আছে গ্রন্থের কোনো কোনো কবিতায়, যে বিধাতাকে অতুলচন্দ্র গুপ্ত মশাই বলেছিলেন 'পুতুল' আর যে বিদ্রোহকে 'পুতুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ'। পৃথিবীকে সেদিন মনে হয়েছিল বন্দীশালা, যেখানে

আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা।

এবং এই কিশোর কবিতাবলীতেই দেখা যাবে শিল্পীর সঙ্গে জীবনের দ্বন্দ্ব কিসে

ঘুচবে, অস্তিত্ব কিসে অর্থময় হ'য়ে উঠবে সে জিজ্ঞাসা উপস্থিত। আর তখন কবি তার উত্তর খুঁজেছিলেন প্রেমের মধ্যে। অস্তিত্ব তখনই অর্থময় হ'য়ে ওঠে হৃদয় যখন বলতে পারে :

তবু আমি ভালোবাসি, তবু আমি ভালোবাসি আজি।

'বন্দীর বন্দনা'র বিশ বছর পরে লেখা 'দ্রৌপদীর শাড়ি'। একদা যে প্রেমের আশ্রয় ছিল নারীদেহে তা এই বিশ বছরের কবিতায় ক্রমে দেহের আশ্রয় ত্যাগ করেছে, হ'য়ে উঠেছে বিশুদ্ধ একটি ভাবনামাত্র, ভাষার অলঙ্কারে সাজিয়ে যে ভাবনাকে রূপ দিতে পারাই শিল্পীর এখন একমাত্র কাজ, তাঁর আনন্দ, তাঁর জীবনের মূল্য। সংশয় এ যুগে অনিবার্য। এমন কি এই তরুণ বয়সের কবিতাতেও প্রেমের কাছে তাঁর কোনো ভাবালু রোমান্টিক প্রত্যাশা নেই :

নদীর শরীর তব যেমন রেখেছে ঢেকে কুৎসিত কঙ্কাল,
তেমনি তোমার প্রেম কোন প্রেতে করিছে গোপন—
তাহা কহিবো কি ?
আমার দুর্ভাগ্য এই সকলি জেনেছি। ('প্রেমিক')

স্বপ্নভঙ্গের তীব্র-যন্ত্রণা নিয়ে তিনি শুধু যদি ব্যঙ্গবিদ্রূপের কবিতা লিখেই শেষ করতেন তাতেও যুগের লক্ষণই থাকতো। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর মনের স্বভাব আস্তিকের। বিনষ্ট অতীত, শূন্যময় ভবিষ্যৎ নিয়ে, বর্তমানের বিভীষিকায় ডুবে মরা তাঁর আস্তিকাবুদ্ধির সম্পূর্ণ বিরোধী। সংশয় অতিক্রম ক'রে এমন কোনো ধ্রুবআশ্রয়ের তিনি সন্ধানী যার অস্তিত্ব খুঁজতে হ'লে কোনো প্রাচীন ধর্ম কিংবা আধুনিক দর্শনের কল্পলোক হাতড়াতে হয় না।

মরণের তিক্ত কালকূট
আমার চরম ভাগ্য।·· .....
তবু যে জাগিছে আজি সংগীত-তরঙ্গ-ভঙ্গ হৃদয়ের হিম সরোবরে—
সে শুধু তোমারি লাগি। ('আর-কিছু নাহি সাধ')

'কঙ্কাবতী'র কবিতাতেও নারীপ্রেমের এই অগাধ কুহকেরই বন্দনা। অনাত্মীয়

বিশ্বপৃথিবীর প্রাণের দরজা খুলে দেয় এই প্রেম, শিল্পীর কাজ সেই প্রেমের গান গাওয়া :

আঁকাবাঁকা মেঘ, একা বাঁকা চাঁদ, বাঁকারেখা চাঁদ, জলের নিচে,
আঁকাবাঁকা জল, একা বাঁকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা।
আমি চেয়ে থাকি, দেখি চোখ ভ'রে : মনে হয় মোর আঁকাবাঁকা জলে,
মেঘের রেখায়
একা বাঁকা চাঁদ চুপচুপ ক'রে কথা ক'য়ে যায় :
ফাঁকা আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঝ'রে পড়ে সুর—'কঙ্কা। কঙ্কা।
কঙ্কাবতী।' ('কঙ্কাবতী')

এমনকি 'নতুন পাতা'তেও প্রেমই ইহলোকের স্বর্গদ্বার। পরিবর্তন দেখা দিয়েছে 'দময়ন্তী'র যুগে। নিঃসঙ্গতাই যে শিল্পীর বিধিলিপি একথা কবি এতদিনে মেনে নিয়েছেন, কেননা যে-প্রেম পৃথিবীকে স্বর্গ বানায় তার বাসা, জীবনই তাঁকে শিখিয়েছে, কোনো মরদেহেই চিরস্থায়ী নয়। নিছক বাঁচার মধ্যে সম্পূর্ণ নয় কোনো আনন্দের বৃত্ত। নিছক বাঁচার সঙ্গে শিল্পীজীবনের তাই জন্মান্তরের ব্যবধান। অতএব প্রার্থনা :

·····আমার ইচ্ছার
চক্র থেকে মুক্ত করো সূর্য, চন্দ্র, সমুদ্র, পাহাড়,
মুক্ত করো জন্ম, মৃত্যু ; আমার প্রেমেরে
প্রেমেরেও মুক্তি দাও ইচ্ছার শৃঙ্খল থেকে—
('দময়ন্তী')

এ-প্রার্থনা, বলা বাহুল্য, শিল্পীর নিজের কাছেই নিজের প্রার্থনা। বহিরাশ্রয়ী মনের স্বাবলম্বী হ'য়ে ওঠার মধ্যে যে বেদনা আছে সেই বেদনাও নিস্পৃহ শিল্পীর কাছে কাব্যের উৎস। এ বিষয়ে কবি নিঃসংশয় হ'তে পেরেছেন 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে এসে। জীবনের নয়, ভাষার পথই শিল্পীর পথ, সঙ্গময় নিঃসঙ্গতার মধ্যে একাগ্রচিত্তে ভাষার প্রতিমা গড়াতেই শিল্পীর পরমার্থ—কবিতার পর কবিতায় এই প্রত্যয়ের কথা তিনি ব্যক্ত ক'রেছেন। শিল্পীর সঙ্গে

জীবনের আপাতবিরোধের অবসান হ'য়েছে। ব্যথা-ব্যর্থতা-হতাশা-বেদনা, সব কিছুর সঙ্গে শিল্পী নিরাসক্ত আত্মীয়তা জেনেছেন :

নবীন আমার প্রৌঢ় বয়স, প্রৌঢ় তোমার যৌবন
তোমাতে আমাতে এক জনমের ব্যবধান।
তোমার জীবনে এখনও ফলিত ললিতকলার রূপরস
আমার জীবন শুধু শিল্পের উপাদান। ('প্রৌঢ় প্রেম')

গত কয়েক বছর ধ'রে বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় বিষয় হিশেবে ভাষা-ছন্দ এবং কবিতার বাহুল্য দেখে যাঁরা বিভ্রান্ত এবং উক্ত লক্ষণকে যাঁরা দুর্লক্ষণ ব'লে জল্পনা ক'রেছেন তাঁরা এই শিল্প সমস্যাটির কথা ভেবে দেখেছেন কিনা জানি না। নবলব্ধ এই প্রত্যয়ের কথা ছন্দের ভাষায় ঘোষণা ক'রেই বুদ্ধদেব ক্ষান্ত হননি। সে প্রত্যয়ের ফলে তাঁর কবিতার রূপগুণের কী পরিবর্তন হ'য়েছে সেটাই বড়ো কথা।

আমার ভাষার ছন্দ, আমার ভাষার স্বপ্ন যদি
ঢেউ তোলে কোনো সুদূর আগামী কল্যে,
আমি বেঁচে আছি সেই কলাকৈবল্যে। ('প্রৌঢ় প্রেম')

কিংবা

তবুও অণুর মন্ত্রমুগ্ধ গণিতে
যদি পারি মোর ভাষার ছন্দে ধ্বনিতে,
যদি তার রূপ ধ'রে দিতে পারি একলা রাতের ভাষায়,
কল্পলোকের আভায়,
সে কোন অনামী অনুকম্পায়ী আগামী কালের জন্য ;—
তাহ'লেই, শুধু তাহ'লেই আমি ধন্য। ('প্রৌঢ় প্রেম')

এ শুধু একটা 'মুডে'র কথা নয়। 'দ্রৌপদীর শাড়ি' থেকেই তাঁর কাব্যে মিতব্যয়ী ভাবভাষার নিগূঢ় সামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে, সঙ্গীতময় প্রবহমানতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে রেখাচিত্রময় ভাষার আশ্চর্য সংহতিগুণ। কঠিন আয়াস-লব্ধ আপাতসহজ ভাবচিত্রের বহু ব্যঞ্জনা অনভ্যস্ত পাঠকের কানমন এড়িয়ে যেতে পারে যদি তিনি শুধু বাইরের চেহারা থেকেই এ কবিতাকে তরল

অনুমান ক'রে থাকেন। আর যাঁরা মনে করেন পৃথিবীকে একটিবার ঢেলে সাজতে পারলেই শিল্পের সঙ্গে জীবনের চিরবিরোধ দূর হ'য়ে যাবে, কাজেই শিল্পীর কর্তব্য বিশ্বশোধনযজ্ঞে তাঁর লেখনীটিকে উৎসর্গ করা, তাঁরা যে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যের সাম্প্রতিক পরিণতি দেখে দীর্ঘশ্বাস মোচন করবেন সেটা স্বাভাবিক। কবিতা লিখতে ব'সে ভাষার ভাবনা তাঁদের কাছে অকিঞ্চিৎকর, যেন সরবে ঘোষণা করবার মতো ভারী এবং দামী কোনো চিন্তা কিংবা অভিলাষ মনের মধ্যে জাগাতে পারাটাই শেষ কথা, তাহলেই আর কোনো সমস্যা থাকবে না। অন্যপক্ষে এলিঅটকেও লিখতে হয় যে ভাষার সমস্যা কবির কাছে জীবনে মেটবার নয় :

So here I am, in the middle way, having had twenty years—
Twenty years largely wasted, the years of *l'entre deux guerres*—
Trying to learn to use words, and every attempt
Is a wholly new start, and a different kind of failure
Because one has only learnt to get the better of words
For the thing one no longer has to say, or the way in which
One is no longer disposed to say it. And so each venture
Is a new beginning, a raid on the inarticulate
With shabby equipment always deteriorating
In the general mess of imprecision of feeling,
Undisciplined squads of emotion. . . . . (*East Coker*)

কবিতার কোনো স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ নেই। প্রাণের আনন্দময় স্বীকৃতিই তার একমাত্র প্রমাণ। অপর প্রমাণ শুধু যে অনিশ্চিত তাই নয়, বিপজ্জনক। তবু যে, এমন কি সৎকবিদের মধ্যেও, একের সঙ্গে অন্যের, এক কবিতার সঙ্গে অন্য কবিতার, বিস্তর তফাৎ তার কারণ সব কবির মনের চরিত্র এক নয়, এক হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। দৈবাৎ যে-পৃথিবীতে বাস করার সুযোগ পাওয়া গেল তার আকাশখানায় কাষ্টম্‌স্-পাস্‌পোর্টের দেয়াল নেই। মাটিতে নিশ্চিন্ত পিঁপড়ে জটিল দুর্গ বানায়। রকম রকম হাওয়া দেয় শীত-গ্রীষ্মের বহুব্যঞ্জনা ভরা। ছায়া ক'রে আসা মেঘের তলায় পীত-সবুজের জামিয়ার ঢাকা বৃক্ষ মাথা নাড়ে। পাখা মুড়ে পোড়ামাটির পায়রার মতো

আষাঢ় ১৩৬১

রাঙা টালির ছাত ব'সেছে পাহাড় ঢালুতে। ধুলোওড়া রাঙা রাস্তার বাঁক দূরে অদৃশ্য। ছুটির দিনে মায়ের মুখে নাইতে যাবার তাড়া আসে। ভিন্নদেশের হানাবাড়ির উঠোনে নতুন ঢেঁকি পাতে বাস্তুহারার দল। বন্যায় গৃহস্থের ডুবুডুবু খড়ো চালায় ব'সে অভুক্ত কুকুর বিশ্বস্ত পাহারা দেয়। খনিতে আবার ধর্মঘট, রেললাইনের পাশে দ্বিখণ্ডিত প'ড়ে নারীদেহ, চওড়া সিঁদুর টক্‌টক্ করছে, বেকার স্বামী ছ'মাস উধাও। জাহাজের রেলিং আঁকড়ে-ধরা সারবন্দী শূন্য চোখ কোন দিগন্তে লড়াই করতে চ'লে গেল, স্বচক্ষে দেখা। সংসারপ্রকৃতির বিচিত্র এই নানাকিছুর সঙ্গে বাঁধা আছি। যোগসূত্র কোনোটা সরু, কোনোটা মোটা, লম্বা, না হয় খাটো। নিবিশেষের এই সামান্য উপকরণ নিয়ে শেষ পর্যন্ত কবির কাজ হচ্ছে ভাষার সাহায্যে ধ্বনিময় প্যাটার্ণ তৈরি করা, যার স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপের মধ্যেই আনন্দ বিধৃত থাকে। কাব্যের এই চরিত্র কারো-কারো ভালো না-লাগতে পারে। সেটা কোনো বড়ো কথা না। হিতবাদী কবির দরজাতেই না-হয় ভিড় করুন তাঁরা। তবে কাব্যের কাছে যাঁদের সব চাইতে বড়ো দাবী আনন্দের দাবী তাঁরা নিশ্চয়ই বুদ্ধদেব বসুর কবিতাবলী আবিষ্কার ক'রে কৃতজ্ঞ হবেন, আধুনিকের মন নিয়ে ঐতিহ্যকে যে-কবি আত্মসাৎ করেছেন, কাব্যরীতির বিবর্তনে সাম্প্রতিকদের মধ্যে আমরা অনেকেই যাঁর কাছে অশেষ ঋণী এবং যাঁর অনুসৃত সশ্রম কাব্যচর্চার মহৎ আদর্শ নিঃসন্দেহে বাংলা কবিতার মর্যাদা বাড়িয়েছে।

'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা'। নাভানা

সমালোচনা

স্বর ও অন্যান্য কবিতা। **কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত**। মডার্ণ পাবলিশার্স, ৬নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২। দেড় টাকা

স্বগত সন্ধ্যা। **আনন্দ বাগচী**। কৃত্তিবাস প্রকাশনী, ৫-এ, নিমতলা লেন, কলকাতা-১৩। দেড় টাকা

কলকাতার সেনেট হলে এই বছর যে কবি-সম্মেলন হ'য়ে গেল সেখানে দৈবক্রমে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমার পাশে বসেছিলেন। সেই সময় সামান্য কৌতুকের কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা লক্ষ্য করেছিলাম। সুভাষের কবিতা-পাঠের সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগল, উত্তেজিতভাবে তাঁকে 'পদাতিকে'-র পাতা উল্টোতে ব্যস্ত দেখলাম। শেষ পর্যন্ত কিন্তু, কিমাশ্চর্য, 'পদাতিকে'-র একটি কবিতাকেও তিনি পাঠ-যোগ্য বিবেচনা করতে পারলেন না। অবশেষে, অনন্যোপায় হয়ে, তিনি তাঁর সাম্প্রতিক কবিতার বই 'চিরকুট' থেকেই কবিতা পছন্দ করলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্করের কবিতার বই হাতে নিয়ে এই ঘটনাটি মনে পড়ল। রচনাগুলি যেন অন্য এক যুগের। বিগত মহাযুদ্ধের সময় বাংলাকবিতাকে যে-সংশয়পীড়িত নৈরাশ্যময় চেতনার সমবেত আর্তনাদ ব্যাপ্ত ক'রে রেখেছিল, 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' সেই দুরস্মৃতিবিজড়িত। প্রচলিত মূল্যগুলির প্রতি অনাস্থা, সৌন্দর্যের মৌল উপকরণগুলির প্রতি ব্যঙ্গমিশ্রিত করুণা, হয়তো তৎকালীন উদ্‌ভ্রান্ত আবহাওয়ায় স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে, আশার কথা, বাংলাকবিতা তার স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে; তরুণতম কবিরা তো নিশ্চয়ই, এমন কি প্রবীণ কবিরাও, যাঁরা একদা দোলাচলে হতবুদ্ধি ছিলেন, জীবনের শাশ্বত সত্যে বিশ্বাসী হয়েছেন। এমতাবস্থায় কিরণশঙ্করের কবিতা, 'স্খলিত প্রণয় আজ ঠেকিছে মামুলি' ইত্যাদি পংক্তি, সুভাষের 'পদাতিকে'-র কবিতার মতোই কেমন যেন দূর-দূর ইতিহাসের ধূসর পাণ্ডুলিপি ব'লে মনে হয়।

'স্বর এবং অন্যান্য কবিতা'র রচনাকাল সম্ভবত যুদ্ধমধ্যবর্তী সময়। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই কবির হতাশাক্রান্ত চেতনার স্বপক্ষে যুক্তি মেলে। তাঁর অনুভবে, তৎকালীন আরো অনেক কবির মতো, কোনো ফাঁকি নেই, তাঁর বেদনাবোধও কিছু ধার করা নয়। কিন্তু আক্ষেপের কথা কোনো সময়েই তা বিশেষ হয়ে ওঠেনি। 'মরুচারী মন খুঁজে ফিরে কোনো শান্তি কি' অথবা 'বাক্যের স্রোতে চায়না কিংবা স্পেইনে যাও' ইত্যাদি পংক্তি সুভাষ-কামাক্ষীপ্রসাদও অজস্র লিখেছেন।

কিন্তু সন্দেহ নেই এই বইয়ের কবিতা পাঠককে স্মৃতিচারণার সুযোগ এবং তজ্জনিত আনন্দ দেবে। উল্লেখযোগ্য কবিতাও এই গ্রন্থে একাধিক আছে। 'একচক্ষু' নামক কবিতাটির কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করি :

প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবরই ছিল আর এখনো তো আছে
সৌন্দর্যের আবেদন ঋতুতে ঋতুতে প্রতি মানুষের কাছে
আকাশে যে সূর্য ওঠে তার পিছে ঘন নীলিমায়
দিগন্তের মেঘে-রঙে অপূর্ব বিস্ময় দেখা যায়,— ...
আমরাই একচক্ষু শুধু, ঘূর্ণাবর্তে গিয়েছি তলিয়ে
ক্ষ'য়ে যাওয়া দগ্ধ চূর্ণ প্রস্তরের মতো।

শিল্পকলার বিবিধ কারুকাজেও কিরণশঙ্কর যত্নবান। তাঁর ছন্দে, শব্দ-ব্যবহারে কৃতিত্ব আছে। যদিও 'স্বর' নামক কবিতায় চলিতের সঙ্গে সাধু ক্রিয়াপদের মিশ্রণ কখনো কখনো পীড়া দেয় এবং 'শারদীয়া' কবিতাটির ছন্দবিন্যাসও কানে বাজে, তথাপি তাঁর সাধনা অবশ্যই সম্মানের।

কবিতার কারুকলায় আনন্দ বাগচী বিশেষ পরিশ্রমী। ছন্দের বৈচিত্র্যে, শব্দের সংস্থাপনে, অনুপ্রাসের দোলায়, উপমার অভিনবত্বে তাঁর অসীম উৎসাহ। এ-সমস্তই শিল্পীর সততাকে প্রমাণ করে। কিন্তু কেবল এইটুকুই যথেষ্ট নয়। আনন্দ বাগচীর কবিতায় এখনো কোনো বিশেষ মন গড়ে ওঠেনি—লঘু-চপলতা, উচ্ছ্বাসের অপব্যয় ইত্যাদি তারুণ্যের সহজ স্বভাবগুলি তাঁর কতিপয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী

কবিতাকে সম্পূর্ণ হ'তে বাধা দিয়েছে। তবু, এই বইতে উল্লেখযোগ্য, মনে রাখবার মতো প্রচুর পংক্তি আছে, যেমন :

ছায়া-তরতর দুপুর সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে
আচমকা কোনো সেগুণ বনের কাঠবেড়ালীর
মুখের মতন থমথমে রোদ।

শিল্পকলার বিচিত্র প্রকরণে যেমন তাঁর সহজাত অনুরাগ, সঙ্গে-সঙ্গে কবিতার বিষয়বস্তুর প্রতিও অধিকতর যত্নবান হ'লে তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক বেশি আশা করতে পারবো। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি যা করতে পেরেছেন তা শুধু আশ্চর্য নয়, ঈর্ষনীয়। শব্দ দিয়ে তিনি একাধারে গান এবং ছবি—দুই-ই ফোটাতে পেরেছেন, বিক্ষিপ্তভাবে দু'এক জায়গায় নয়, ফোয়ারার মতো অজস্রধারায়। প্রথমকাব্যগ্রন্থে এতখানি প্রতিশ্রুতি আর কোনো তরুণ কবির ক্ষেত্রে দেখেছি ব'লে মনে হয় না।

অরুণকুমার সরকার

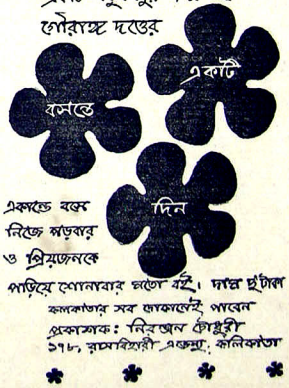

KAVITA—Vol. 18, No. 4, August, 1954

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d, or $ 1. 10.
Per Copy Rupee 1/-

Published quarterly at Kavitabhavan, 202, Rashbehari Avenue, Calcutta 29 India.
Editor & Publisher: **BUDDHADEVA BOSE**
Printed by Temple Press, 2, Nayaratna Lane, Calcutta 4